সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'উচ্চশ্রেণীর সংগীতের সুখানুভব, শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবে না।'[১] তাই তিনি মনে করেন, 'যেমন রাজনীতি, ধৰ্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যেরই জানা উচিত, তেমনি শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, এবং চিত্তপ্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীতবিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কৰ্ত্তব্য।'[২] তিনি একথাও বলেছিলেন, 'শাস্ত্রে রাজকুমার রাজকুমারীদিগের অভ্যাসো পযোগী বিদ্যার মধ্যে সংগীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যাদিগের সঙ্গীত শিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন। কুলকামিনীরা সঙ্গীতনিপুণা হইলে, গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়।'[৩] গৃহদেবতা রাধাবল্লভের নানা পালাপার্বণ উপলক্ষে কাঁটালপাড়ার চাটুজ্জেবাড়িতে যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ গান কিংবা কীর্তনের আসর লেগেই থাকত। আর সেই সাংগীতিক পরিবেশই যে শৈশব থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সুরের কান ও গীত-সংস্কার তৈরি করে দিয়েছিল তা স্পষ্টভাবেই বলা চলে। পালাকীর্তনের প্রতি প্রবল আগ্রহ তাঁকে করে তুলেছিল বৈষ্ণব গীতিপদের এক বিপুল সংগ্রাহক। পরবর্তী সময়ে তিনি রীতিমতো নাড়া বেঁধে প্রখ্যাত ধ্রুপদশিল্পী যদুভট্টের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিমও নিয়েছেন। শোনা যায়, নিতান্ত কিশোর বয়স থেকেই মুখে মুখে গান রচনায় এবং তাতে তৎক্ষণাৎ সুরসংযোগে সুদক্ষ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। অনুজ পূর্ণচন্দ্রের একটি বিবরণ থেকে জানা যায়,

> যখন চোদ্দ পনের বৎসর বয়ঃক্রম, তখন একখানি নৌকায় বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রাতাদিগের সহিত ফরাসডাঙ্গায় ভাসান দেখিতে গিয়াছিলেন। আসিবার সময়ে সন্ধ্যা হইল। ভাগীরথীর পূৰ্ব্বতীরে শ্মশানভূমিতে একটি শবদাহ হইতেছিল। নিকটে অনেকগুলি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া; একটি স্ত্রীলোক উন্মত্তার ন্যায় প্রজ্বলিত চিতাতে ঝাঁপ দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গিনীগণ তাহাকে ধরিল। অবশেষে এই সদ্যবিধবা স্ত্রী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল, সকলেরই এরূপ হইল।

> নৌকাতে অবস্থিতিকালে বঙ্কিমচন্দ্র সদ্য একটি গীত রচনা করিলেন। ঐ নৌকাতে এই লেখক ছিলেন, তাহাকে চুপি চুপি ঐ গানটি শুনাইলেন, কেন না, তাঁহার অগ্রজেরা ঐ নৌকাতে ছিলেন। কিছুদিন ঐ গানটি মল্লার রাগিণীতে প্রচলিত ছিল, পরে লুপ্ত হইয়া যায়। গানটির প্রথমাংশ আমার মনে আছে, আর নাই; যথা :—
> "হারালে পর পায় কি ফিরে মণি — কি ফণিনী, কি রমণী?"[5]

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত বা তাঁর উপন্যাসাবলীতে ব্যবহৃত গানের স্পষ্টতই দুটি ধারা—একটি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত, অপরটি বাংলার লোকসংগীত, বিশেষত পালাকীর্তন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি বঙ্কিমচন্দ্র রীতিমত নাড়া বেঁধে প্রখ্যাত ধ্রুপদশিল্পী যদুভট্টের (যদুনাথ ভট্টাচার্য ১৮৪০-৮৩) কাছে তালিম নিয়েছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র তথা বঙ্কিমজীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী' তে লিখেছেন,

> ... ত্রিশ বৎসরের পর 'মৃণালিনী' লিখিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস ও বিজ্ঞান পাঠ আরম্ভ করেন। এই সময় সংগীত-শিক্ষার ঝোঁক চাপিয়াছিল। সুযোগও বেশ হইয়াছিল। কাঁটালপাড়ায় একজন বঙ্গবিশ্রুত গায়ক বাস করিতেন, তাহার নাম যদুভট্ট তানরাজ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা বেতন দিতেন। এই যদুভট্টের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র সংগীতাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন।[6]

'মৃণালিনী' প্রকাশিত হয় ১০ নভেম্বর ১৮৬৯। ১৮৬৮-র ৪ জুন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত কাজে ৬ মাসের ছুটি নিয়েছিলেন। আর ১৮৬৮-র শেষ দিকে তিনি 'মৃণালিনী' লিখতে শুরু করেন। সুতরাং শচীশচন্দ্রের বক্তব্য অনুযায়ী যদুভট্টের কাছে তাঁর গান শেখার শুরুও এই সময়ই। তবে সংগীতচর্চা নিয়মিত হয়নি বলেই বোধহয়। কারণ ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬৯ বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে কাজে যোগ দেন। যদিও ১৮৭২-এ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের পর সপ্তাহান্তে বঙ্কিমচন্দ্র যখন কাঁটালপাড়ার বাড়িতে ফিরতেন তখন তাঁর বৈঠকখানার বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শনের মজলিশে' যদুভট্টও উপস্থিত থাকতেন।

যদুভট্টের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আলাপ চুঁচড়োর একটি সংগীতের আসরে। আসরের শুরুতে এই দুই মহারথী কীভাবে অনভিপ্রেত বিবাদে জড়িয়ে পড়েন সে বিষয়ে একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে। ঘটনার সূত্রপাত তানপুরা বাঁধাকে কেন্দ্র করে। এক-একজন গায়ক তানপুরায় সুর বাঁধতে অনেকটা সময় নেন। সুর যতক্ষণ না তাঁর মন মতো না হচ্ছে ততক্ষণ তিনি গান আরম্ভ করেন না। এতে শ্রোতার ধৈর্য্যচ্যুতি হলেও সেদিকে গায়কের কোনো খেয়াল থাকে না। যদুভট্টও ছিলেন সেই প্রকৃতির গায়ক। সেদিনের আসরেও তিনি একমনে তানপুরায় সুর বাঁধছেন। কিন্তু সুর কিছুতেই তার মন মতো হচ্ছে না। দীর্ঘক্ষণ এভাবে চলার পর এক সময় বঙ্কিমচন্দ্র ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন এবং যদুভট্টের তানপুরাটির দিকে তাকিয়ে শ্লেষাত্মক গলায় বলে ওঠেন, 'লাউ-কুমড়ো বাঁধা কখন শেষ হবে?' সুরের আসরে এমন বেসুরো মন্তব্য শুনে যদুভট্টেরও মেজাজ বিগড়ে যায়। তিনিও গলা চড়িয়ে বলেন, 'এমন গোয়ালঘরে আমি গান গাইব না'। শুধু তাই নয়, এরপর

তিনি তানপুরাটি আছাড় দিয়ে ভেঙে আসর ছেড়ে চলে যান। ওদিকে এই ঘটনায় বঙ্কিমচন্দ্রও অপমানিত বোধ করে সভা ছেড়ে চলে যেতে উদ্যোগী হলে উদ্যোক্তারা পড়েন বিপদে। তাঁদের কয়েকজন বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুভট্টকে আলাদাভাবে ডেকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। যদুভট্টকে বলা হয়, উনি কে তা বোধহয় আপনি জানেন না। ওঁর নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উনি একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এই বয়সেই মস্ত বড়ো লেখক হয়েছেন। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুন্ডলা এসব বই ওঁরই লেখা। উনি গান-বাজনা ভীষণই ভালোবাসেন। ওঁর কথা ধরবেন না। আপনি গাইলে ওঁর নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। দয়া করে আসরে আসুন আপনার গান শোনার জন্য অনেক দূর থেকে অনেকে এসেছেন। তাঁদের নিরাশ করবেন না। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হয়, উনি কে তা জানেন নিশ্চয়। ওঁর নাম যদুভট্ট, ওঁর মতো ধ্রুপদ খুব কম লোকেই গাইতে পারেন। আপনি অনুগ্রহ করে বসুন। ওঁর গান শুনলে আপনার নিশ্চয় ভালো লাগবে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ অনুনয়-বিনয়ের পর দুজনেই শান্ত হন। ভাঙা আসর আবার জোড়া লাগে। যদুভট্টকে অন্য একটি তানপুরা দেওয়া হয়। তিনি যথারীতি তাতে আবার দীর্ঘসময় নিয়ে সুর বাঁধেন। এবার কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ধৈর্য্য নিয়ে বসে থাকেন। সুর বাঁধা শেষ করে যদুভট্ট গান শুরু করলেন। দরবারি কানাড়া। মুহূর্তেই তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে অন্যান্য শ্রোতাদের মতো বঙ্কিমচন্দ্রও অভিভূত হয়ে গেলেন। যদুভট্ট শ্রোতাদের মন জয় করে গাইতে লাগলেন,

রাধারমণ মদনমোহন মুকুন্দ মুরারি।
মধুসূদন মনোহর ময়ূরপুচ্ছধারী।।

গান শেষ হলে কোথায় হারিয়ে গেল বঙ্কিমের সেই রুদ্রমূর্তি। তখন তিনি সম্পূর্ণ এক অন্য মানুষ। যদুভট্টও শ্রোতার মন জয় করতে পেরেছেন জেনে খুশি হলেন। সেই শুরু। এরপর বঙ্কিমচন্দ্র যখন শাস্ত্রীয় সংগীতের পাঠ নেবেন বলে ঠিক করলেন, তখন বয়সে দু'বছরের ছোট হলেও যদুভট্ট ছাড়া আর কারও কথা তাঁর মাথায় আসেনি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় বাংলায় রাগসংগীত চর্চার সুবর্ণ যুগ। একদিকে মেটিয়াব্রুজে লক্ষ্ণৌয়ের রাজ্যচ্যুত নবাব 'সংগীত-সর্বস্ব' ওয়াজেদ আলি শা'র সংগীতের দরবার, যার স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায় 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বর্ণিত নবাব কতলু খাঁর নৃত্যগীতবিলাসে। অন্যদিকে পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগীতের আসর, যা কলকাতার প্রাণচঞ্চল সংগীত-তীর্থরূপে পরিগণিত। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বরাহনগরে এঁদেরই বাগানবাড়ি মরকতকুঞ্জে (Emerald Bower, বর্তমানে যেখানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.টি রোড ক্যাম্পাস অবস্থিত) ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি সরস্বতীপুজোর দিন অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বার্ষিক কলেজ

রি-ইউনিয়ন অনুষ্ঠানে 'রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের মুর্তিমান রাগাদি (tableau vivantes)'[৭] শুনতে উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এছাড়াও সেসময় ধনী পরিবারে উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা ও বৈঠকী আড্ডা ছিল বনেদিয়ানার অঙ্গ। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সংগীতচর্চার কথা আমরা রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখের স্মৃতিকথায় উল্লেখ পাই। সুতরাং একথা বলাই যায়, 'বঙ্কিমের সমকালের কলকাতায় মাগরীতির নৃত্যগীতের একটি সজীব পরিমন্ডল বিরাজ করছিল।'[৮] যে পরিমন্ডলের সঙ্গে সংগীতপ্রিয় বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।

প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই বঙ্কিমচন্দ্র সংগীতের একটি সুন্দর আবহ রচনা করলেন। প্রথম খন্ড পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে গভীর রাত্রে বিমলা গড় মান্দারণ থেকে শৈলেশ্বর মন্দিরে চলেছেন। উদ্দেশ্য জগৎসিংহের সঙ্গে গোপন সাক্ষাৎ। সঙ্গী 'রসিকরতন' গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ। এই স্বল্পবুদ্ধির মানুষটির সঙ্গে সময় কাটানো ও তাকে অন্যমনস্ক রাখার লক্ষ্যে বিমলা ভুতের গল্প ছাড়া আর যে উপায় অবলম্বন করলেন, তা হল গান। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র জানেন 'মনুষ্য সঙ্গীত প্রিয়।' যার কন্ঠে সুর নেই সেও কখনো সংগীত-বিমুখ নয়। 'গীত মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবজাত।' [৯] 'রসিক পুরুষ কে কোথায় সঙ্গীতে অপটু'[১০] তাই রূপসী বিমলার অযাচিত প্রণয়দাক্ষিণ্যে বিগলিত দিগ্‌গজ গাইতে আরম্ভ করল,

এ হুম্—উ, হুম্—
সই, কি ক্ষণে দেখিলাম শ্যামে
কদম্বেরি ডালে।
সেই দিন পুড়িল কপাল মোর—
কালি দিলাম কুলে।

সেকালে প্রচলিত কায়স্থ কমলাকান্তের রূপাভিসারের পদ 'কি ক্ষণে শ্যামচাঁদের রূপ নয়নে লাগিল'।[১১] কিংবা বেলডাঙার রূপচাঁদ অধিকারীর ঢপ্‌কীর্তন 'কি রূপ দেখিনু কদম্বমূলে/কলিন্দ নন্দিনীর কূলে—'[১২] ইত্যাদি বাংলা গানের আদলে বাঁধা বঙ্কিমের গীতিপদ দিব্যি মানানসই হয়ে গেল সাধারণ মানুষ গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের কন্ঠে। তার উৎকট কন্ঠের গান শুনে পথের ধারে শুয়ে থাকা একটি গাভী পলায়ন করল বটে, কিন্তু এই গানের সূত্র ধরেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গেয়ে উঠলেন সংগীতনিপুণা বিমলা।

> দিগগজের আর গান হইল না; হঠাৎ তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল; অমৃতময়, মানসোন্মাদকর, অপ্সরোহস্তস্থিত বীণাশব্দবৎ মধুর সংগীতধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। বিমলা নিজে পূর্ণস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন।
>
> নিস্তব্ধ প্রান্তরমধ্যে নৈশ গগন ব্যাপিয়া সেই সপ্তসুরপরিপূর্ণ ধ্বনি উঠিতে লাগিল। শীতল নৈদাঘ পবনে ধ্বনি আরোহণ করিয়া চলিল।

কী গান গাইছিলেন বিমলা? 'বাঙলা' নয়, কারণ গানটি শেষ হবার সঙ্গে

সঙ্গেই গজপতি তাকে 'একটি বাঙলা গাও' বলে পুনর্ব্বার গাইতে অনুরোধ করে। তাহলে প্রথমে কি গাইছিলেন বিমলা, নিঃসন্দেহে শুদ্ধ কোনো হিন্দুস্থানি রাগসংগীত। কারণ দ্বিতীয় খন্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমরা দেখি যুবরাজ জগৎসিংহকে লেখা তাঁর পত্রে বিমলা জানাচ্ছেন, তিনি ছিলেন মানসিংহের মহিষী জগৎসিংহের বিমাতা ঊর্মিলা দেবীর সহচারিণী দাসী। কিন্তু, '...তিনি আমাকে সহচারিণী দাসী বলিয়া জানিতেন না, আমাকে প্রাণাধিকা সহোদরা ভগিনীর ন্যায় জানিতেন। তিনি আমাকে সযত্নে নানা বিদ্যা শিখাইবার পদবীতে আরূঢ় করিয়া দিলেন।..তাঁহারই মনোরঞ্জনার্থে নৃত্যগীত শিখিলাম।" বিমলার এই মোহিনী কণ্ঠস্বরেই মুগ্ধ হয়েছিলেন নবাব কতলু খাঁ। মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে বিমলার গান শুনে তাঁর মনে হয়েছিল, 'এ কি মানুষের গান, না সুররমণী গায়?'

গীতরচয়িতা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আত্মপ্রকাশ অবশ্যই 'মৃণালিনী' উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালিকে বলেছেন, 'স্বভাব গীতমুখর ও গীতমুগ্ধ'।[১৩] বাঙালির সেই স্বভাব গীতমুখর সত্তার জীবন্ত প্রতীক ভিখারিনি গিরিজায়া। সমগ্র উপন্যাসে মোট বারোটি গানের মধ্যে দশটিই তার কণ্ঠনিসৃত। দু'টি গান গেয়েছে নায়িকা মৃণালিনী। আসলে মৃণালিনী এখানে গীতমুগ্ধ শ্রোতা।

প্রথম খন্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদে গিরিজায়ার প্রথম প্রবেশ। তার 'কোমলকণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীতে' মৃণালিনী উৎকর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে সে এটাও বুঝেছে যে, ভিখারিনি বেশে গিরিজায়া আসলে দূতী। হেমচন্দ্র প্রেরিত সংকেত বহন করে এনেছে সে। তাই গিরিজায়ার গানই দুটি অর্থ প্রকাশ করে। একদিকে কানু ও রাই, অন্যদিকে হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী। গিরিজায়া গেয়ে চলে,

মথুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি, শ্যামবিলাসিনি— রে।
কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাঁহে বিবাসিনী— রে।।

মৃণালিনীর অনুরোধে গানটি দ্বিতীয়বার গাইবার পর মৃণালিনী গিরিজায়াকে জিজ্ঞাসা করেছে 'তুমি গীত সকল কোথায় পাও?' উত্তরে গিরিজায়া জানায় 'যেখানে যা পাই তাই শিখি।' কথায় কথায় বঙ্কিমচন্দ্র যেন আমাদের জানিয়ে দিলেন হাটে মাঠে বাটে গান গেয়ে ফেরা বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা চিরকালই বাংলার সেরা গীত-সংগ্রাহক।

গানটির ফুটনোটে আছে 'এই গীত ঢিমে তেতালা তাল যোগে জয়জয়ন্তী রাগিণীতে গেয়।' বঙ্কিমচন্দ্রই যে ব্রজবুলিতে রচিত এই গীতিপদটির স্রষ্টা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু এই গানটিই নয়, 'মৃণালিনী'তে তিনি ব্রজবুলি ভাষায় এমন গান একাধিক রচনা করেছেন। 'মৃণালিনী' যখন প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ আট বছরের বালক। 'সুতরাং শুধু ভানুসিংহ নন, ব্রজবুলিকে নতুনভাবে ব্যবহার করার অগ্রপথিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্যে বিশেষ গৌরবের

দাবিদার।’[১৪] দ্বিতীয় গান,

যমুনার জলে মোর, কি নিধি মিলিল।
ঝাঁপ দিয়া পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,
পরেছিনু কুতূহলে, যে রতনে।।

একদিন হেমচন্দ্র জলমগ্না মৃণালিনীকে উদ্ধার করে বাঁচিয়েছিলেন। সেই তাঁদের প্রথম পরিচয়; পরে অনুরাগ ও শেষে আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়ে তাঁদের বিচ্ছেদের কথাই যেন এ গানে স্পষ্ট।

ব্রজবুলিতে রচিত তৃতীয় গানে মৃণাল-হারা হেমচন্দ্রের উদ্‌ভ্রান্ত দশার কথা বর্ণনা করেছে গিরিজায়া,

ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরনু বহু দেশ।
কাঁহা মেরে কান্ত বরণ, কাঁহা রাজবেশ।।

এই গানের অভিঘাতেই খুলেছে আত্মসংবৃত মৃণালিনীর গোপন ব্যথার উৎসমুখ। ভিখারিনির কাছে গানের মারফতেই সে জানিয়েছে আপন হৃদয়ের কথা,

কন্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তার ডুবাইল পীড়িয়া মরমে।।

দুঃখের এই পাঁচালি গান মৃণালিনী তার বুক নিঙড়ানো ‘চক্ষের জলটুকসুদ্ধ’ শিখিয়েছে গিরিজায়াকে। সে যেন এ গানের মর্মস্পর্শী আবেদনটুকু যথাসম্ভব পৌঁছে দেয় হেমচন্দ্রের কাছে। কিন্তু এ গান তাকে শেখাতে হয়েছে অত্যন্ত সন্তর্পণে, আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ ও তাঁর কন্যা মণিমালিনীর কান বাঁচিয়ে। মনিমালিনী যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছে— ‘সই ভিখারিণীকে কাণে কাণে কি বলিতেছিলে?’ মৃণালিনী গান গেয়ে তার উত্তর দিয়েছে,

কি বলিব সই—
সই মনের কথা সই, সই মনের কথা সই—
কাণে কাণে কি কথাটি ব’লে দিলি ওই।।

রহস্যপ্রিয় লোককবির গানের মতো যমক-অনুপ্রাসের বহুল ব্যবহারে হালকা চালের এই গানটিতে চাপা বেদনার গুমোট মেঘ কিছুটা হলেও যেন সরে যায়, ঝলকিয়ে ওঠে স্বস্তির প্রসন্ন রোদ। মৃণালিনীর স্বস্তি— হেমচন্দ্রের সন্ধান জেনে, আনন্দ প্রিয়তমের সঙ্গে বার্তা বিনিময়ের সুযোগ পেয়ে। এই খন্ডের শেষ পরিচ্ছেদেও গিরিজায়ার কণ্ঠে রয়েছে একটি গান। মৃণালিনী নবদ্বীপ যেতে চাইলে তার স্বেচ্ছাসাথী হতে চেয়ে গিরিজায়া গেয়ে ওঠে,

মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে।
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় আয় রে।।

দ্বিতীয় খন্ডের তৃতীয় পরিচ্ছদে 'নৌকাযানে' নদীবক্ষে একটি ক্ষুদ্র তরণীতে ভেসে চলেছে মৃণালিনী ও গিরিজায়া। তাদের কথোপকথনের মধ্যে বসানো গানের কলিগুলি যেন একটি কীর্তনের আসর। প্রথম গান,

চরণতলে দিনু হে শ্যাম পরাণ রতন
দিব না তোমারে নাথ মিছার যৌবন।।

দ্বিতীয় গান,

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে।।

তৃতীয়খন্ডের চতুর্থ পরিচ্ছদের শিরোনাম 'উপনয় বহ্নিব্যাপ্যো ধূমবান্'। এই পরিচ্ছেদে গিরিজায়া আবারও একবার দূতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। এবার তার গানে উৎকর্ণ হেমচন্দ্র। গিরিজায়া গেয়ে চলে—

প্রথম গান,

কাঁহে সই জীয়ত মরত কি বিধান?
ব্রজ কি কিশোর সই কাঁহা গেল ভাগই
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ।।

দ্বিতীয় গান,

এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে।
কিবা জন্মজন্মান্তরে, এ সাধ মোর পুরাইবে।।

হেমচন্দ্র যতটা না গান শুনেছেন, তার চেয়ে বেশি শুনেছেন গিরিজায়ার মুখের কথা, গিরিজায়ার মিথ্যা ভাষণ। মৃণালিনী অন্যের বধূ হতে চলেছে— এই কথা বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল গিরিজায়া। কিন্তু ভ্রান্ত হয়নি মৃণালিনী, তার প্রেম যে ধ্রুবজ্যোতি। হেমচন্দ্রের নিষ্ঠুর বাক্যবাণ 'কুলটার পত্র আমি পড়িব না', নির্দয় আচরণ—'মৃণালিনীর লিপিখানি না পড়িয়া তাহা খন্ড খন্ড করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিলেন', মৃণালের কাছে সবিশেষ বিবৃত করে গিরিজায়া। কিছুই লুকায় না সে। এতে মৃণালিনীর প্রতিক্রিয়া কী? 'নীরব মৃণালিনী রোদনও করিলেন না। যেরূপ অবস্থায় শ্রবণ করিতেছিলেন সেইরূপ অবস্থাতেই রহিলেন।' প্রিয়জনের থেকে প্রাপ্ত এই অপ্রত্যাশিত আঘাত তাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। কিন্তু বেদনাহত সেই মূক নারীর হৃদয়ে যে নিঃশব্দ রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, তার পতন শব্দ শুনতে পেয়েছে সখি গিরিজায়া। 'বিষাদময়ী পাষাণ প্রতিমাকে অন্ধকারে একান্তে রেখে তাই সে গীতি-বিলাপে ঘটিয়েছে তারই সখির ভাবমোক্ষণ।'[১৫]

পরাণ না গেলো।
যো দিন পেখনু সই যমুনাকি তীরে,
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে।

কীর্তন গানের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহের কথা আমরা শুরুতেই আলোচনা করেছিলাম, এবং এই আগ্রহই তাঁকে করে তুলেছিল বৈষ্ণব গীতিপদের এক বিপুল সংগ্রাহক। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে Calcutta Review পত্রিকার ১০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'Bengali Literature' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন,

> The first in order are the lyric poets, at the head of whom must be placed Vidyapati. They are exclusively vaisnavite, and their songs either celebrate the amorous of Krishna or the holiness of Chaitanya. They are still sung by bands of Bairagies and are Popularly Known under the name of Kirtan. Their number is immenese. The present writer has in his possession a collection which contains more than three thousand of these songs.

সংগীতপ্রেমী বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন এদেশে ধ্রুপদের প্রবল প্রতাপ- প্রতিপত্তির অনেক আগে থেকেই বাংলা কীর্তনের মধ্য দিয়ে রাগসংগীতের চর্চা প্রচলিত ছিল। কীর্তনই ছিল বাংলার নিজস্ব ধ্রুপদী গান। কীর্তন বিশেষজ্ঞ খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে, 'জয়দেবের সময় হইতে কীর্তনের প্রবাহ আসিয়াছে বলিয়া ধরা হয়।'[১৬] প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা শৈলীতে 'মৃণালিনীর' গানগুলি বেঁধে কীর্তনের প্রসারিত কালসীমার প্রতিই যেন ইঙ্গিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কীর্তনের মতো বাউল গানেরও যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একজন মুগ্ধ শ্রোতা তার প্রমাণও রয়েছে 'মৃণালিনী'র কোনো কোনো গানে। 'মেঘ দরশনে'র সমান্তরাল একটি লালনগীতি— 'চাতক স্বভাব না হলে...' কিংবা লালন শিষ্য গোঁসাই গোপালের 'না জেনে অকূল পাথারে ভাসালাম তরী'র সঙ্গে তুলনা করা যেতেই পারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে'র। মনে রাখতে হবে কর্মজীবনের শুরুতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র ঘুরে বেরিয়েছেন যশোহর-খুলনার গ্রামে গঞ্জে। ছেঁউড়িয়া গ্রামের লালন ফকিরের (১৭৭৪ - ১৮৯০) গান তার অনেক আগে থেকেই ছড়িয়ে পড়েছে উত্তর-পূর্ব বাংলা জুড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে লালন সাঁইয়ের কখনো সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা এমন তথ্য পাওয়া না গেলেও গীত-সংগ্রাহক বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে লালনগীতি সংগ্রহ করা কোনো অসম্ভব ব্যাপার ছিল না।

'মৃণালিনী'র মতোই কীর্তনের আসর জমে উঠেছে পরবর্তী উপন্যাস 'বিষবৃক্ষে'ও। সপ্তম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্র দত্তের ঠাকুর বাড়িতে 'আর্কফলা' নাচানো বৈরাগির দল ও বৈরাগিরঞ্জন রসকলি' কাটা বৈষ্ণবীদের সমাবেশ ঘটিয়ে আধুনিক কীর্তনিয়ার নমুনা পেশ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র,

> কোথাও বৈরাগীর দল শুষ্ক কণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া, তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, মাথায় আর্কফলা নড়িতেছে, এবং নাসিকা দোলাইয়া 'কথা কইতে যে পেলেম না— দাদা বলাই সঙ্গে ছিল— কথা কইতে যে' বলিয়া

কীর্তন করিতেছে। কোথাও বৈষ্ণবীরা বৈরাগিরঞ্জন রসকলি কাটিয়া, খঞ্জনীর তালে 'মধো কানের' কি 'গোবিন্দ অধিকারীর গীত গায়িতেছে। কোথাও কিশোরবয়স্কা নবীনা বৈষ্ণবী প্রাচীনার সঙ্গে গায়িতেছে, কোথাও অর্ধবয়সী বুড়া বৈরাগির সঙ্গে গলা মিলাইতেছে।

নবম পরিচ্ছেদে আমরা পেলাম হরিদাসী বৈষ্ণবীকে। হরিদাসী আসলে ভেকধারী। জাল বোষ্টমী। নগেন্দ্রর অন্তঃপুরে প্রবেশের জন্য দেবেন্দ্র দত্তই এই ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। জাল বোষ্টমী হরিদাসীর গানের ঝুলিতেই আঠারো শতকের শেষপাদ ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা গানের পশরা সাজিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'সম্ভবত তিনি বোঝাতে চান— একালের এই ভেকধারী বোষ্টমীর মতই এ কালের গানও জাল। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কথার আড়ালে দেহবাদী বাসনার লালন ও প্রকাশ এখন গীতিকারের মূল অভিপ্রায়।'[১৭] গিরিজায়ার মতো গান গেয়ে সবাইকে উৎকর্ণ করে দিয়ে হরিদাসীর আত্মপ্রকাশ নয়, বেশ শোরগোল তুলে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়ে আবির্ভূত হয়েছে সে,

শ্রীমুখপঙ্কজ— দেখবো বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।

কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যেই যে হরিদাসীবেশী দেবেন্দ্রের আগমন তা তার গানে পরিষ্কার। কুন্দর রূপজ মোহে জ্বলে পুড়ে মরছে দেবেন্দ্র। মানের গরব ত্যাগ করে কুন্দ বৈষ্ণবীর ওপর একটু সদয় হলেই সে বাঁচে। তাই রূপমোহের গান। পরের গানটিতেও খঞ্জনীতে মৃদু মৃদু খেমটা বাজিয়ে দেবেন্দ্র স্পষ্টতই কুন্দর সঙ্গ কামনা করেছে,

আয়রে চাঁদের কণা
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পড়তে দিব সোণা।

তৃতীয় গানে দেবেন্দ্র আরও প্রগলভ,

কাঁটাবনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল,
গো সখি কাল কলঙ্কেরি ফুল।

এই গান শুনে সুর্যমুখী বলেছিল, 'ও সব গান আমার ভাল লাগে না। গৃহস্থ বাড়ি ভাল গান গাও'। অর্থাৎ এ গান 'বাগানবাড়ির' গান। সম্ভ্রান্ত গৃহস্থবাড়ির পক্ষে যা রুচিশীল নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমশ প্রকাশ করেছেন বৈষ্ণবীবেশে দেবেন্দ্র দত্তের প্রকৃত রূপ। তাই প্রথমে উচ্চাঙ্গ কীর্তনের পর 'ঢপ' এবং শেষে 'বাগানবাড়ির' গান বসিয়েছেন তার গলায়।

সপ্তদশ পরিচ্ছদে পানোন্মত্ত দেবেন্দ্র 'ঝিম্‌কিনি মারিয়া' গোপাল উড়ের

টপ্পার ধাঁচে টুসকি চালে গান গেয়ে চলে আপন মনে,

আমার নাম হীরা মালিনি।
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে, কুব্জা আমার ননদিনী।

দেবেন্দ্রর 'ঝিম্‌কিনি' মেরে গাওয়া একইরকম আরেকটি আবোলতাবোল গান হল,

বয়স তাহার ষোল,
দেখতে শুনতে কালো কোলো

আর হীরার সুপ্ত দেহ-বাসনার পরিচয় রয়েছে তার গাওয়া একটি খেমটা গানে,

মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়
সাগর ছেঁচে তুলব নাগর পতন করে কায়;

'মৃণালিনী' বা 'বিষবৃক্ষে'র মতো না হলেও 'ইন্দিরা'তেও বেশ কয়েকটি গান সংযোজন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে কলকাতায় যাবার সময় ঘাটে মেয়েদের কলসী কাঁখে জল ভরতে আসতে দেখে ইন্দিরার মনে পড়েছে একটি 'প্রাচীন গীত',

একা কাঁখে কুম্ভ করি, কলসীতে জল ভরি,
জলের ভিতরে শ্যামরায়।

এখানেই ইন্দিরা অমলা ও নির্মলা নামে দুটি সাত-আট বছরের মেয়ের দেখা পেয়েছে, যারা 'কাঁকালে ছোট ছোট দুইটি কলসী' নিয়ে 'ঘাটের রাণায় নামিবার সময়ে জোয়ারের জলের একটা গান গায়িতে গায়িতে নামিল। ... একজন এক এক পদ গায়, আর একজন দ্বিতীয় পদ গায়।' ইন্দিরার গানটি মিষ্ট লেগেছিল, তাই সে পুরো গানটি শোনাতে চেয়েছে পাঠককে। 'ধানের ক্ষেতে, ঢেউ উঠেছে, বাঁশ তলাতে জল। আয় আয় সই, জল আনিগে জল আনিগে চল।।...' দীর্ঘ এ গানে 'আয় আয় সই, জল আনিগে জল আনিগে চল।' কথাটি ধুয়ার আকারে বারবার এসেছে।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের সূচনাই হচ্ছে নবাব মীরকাশেমের পত্নী দলনী বেগমের গানের দৃশ্য দিয়ে। মুঙ্গের দুর্গের অন্তঃপুরে রঙমহলে গালিচার উপর বসে আছেন দলনী বেগম। একটি ক্ষুদ্র বীণা হাতে করে তিনি অতি মৃদুস্বরে গান গাইছেন। এমন সময়ে সেখানে উপস্থিত হলেন নবাব মীরকাশেম। দলনী বিবিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'তুমি যাহা গায়িতেছিলে, গাও— আমি শুনিব।' দলনি প্রথমে বেসুরো বাজনার ছুতো করেছে; শেষে ইংরেজি বাজনার বাহানা তুলে বলেছে, 'আমি গায়িব না।' নবাব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কেন, রাগ না কি?' দলনী উত্তর করেছে, 'কলিকাতার ইংরেজরা যে বাজনা বাজাইয়া গীত গায়, তাহাই একটি আনাইয়া দেন, তবেই আপনার সম্মুখে পুনর্বার গীত

গায়িব, নহিলে আর গায়িব না।' অন্যদিকে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভীমা পুষ্করিণীতে সন্ধ্যাবেলা জল ভরতে গিয়ে সাঁতার কাটার সময় শৈবলিনী যখন সই সুন্দরীকে অনুরোধ করেছে 'ভাই, চুপি চুপি একটি গান গা না'। তখন সুন্দরী উত্তর করেছে 'দুর হ! পাপ! ঘরে চ!' দলনীর গানের দৃশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে দেখান গান বাজনা মুসলিম সমাজে সংস্কৃতির অঙ্গ। বাদশা বেগমের কাছে গান শুনতে চান। বেগম অনায়াসে বাদশার কাছে ইংরেজি বাজনা এনে দেবার বায়না ধরে, সেখানে হিন্দুসমাজে কুলবতী নারীর নিভৃতে গান গাওয়াও 'পাপ'। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় আলোচ্য উপন্যাসের পঞ্চম খন্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদ 'নৃত্যগীত'-অংশের কথা। পরিচ্ছেদের শুরুতেই রয়েছে বিলাস-বৈভবে মোড়া ধনকুবের জগৎশেঠ ভাইদের জলসাঘরের বর্ণনা,

> মুঙ্গেরে প্রশস্ত অট্টালিকামধ্যে স্বরূপচন্দ জগৎশেঠ এবং মাহতাবচন্দ জগৎশেঠ দুই ভাই বাস করিতেছিলেন। তথায় নিশীথে সহস্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তথায় শ্বেতমর্মরবিন্যাসশীতল মন্ডপমধ্যে, নর্তকীর রত্নাভরণ হইতে সেই অসংখ্য দীপমালারশ্মি প্রতিফলিত হইতেছিল। জলে জল বাঁধে— আর উজ্জ্বলেই উজ্জ্বল বাঁধে। দীপরশ্মি, উজ্জ্বল প্রস্তরস্তম্ভে—উজ্জ্বল স্বর্ণ-মুক্তা-খচিত মসনদে, উজ্জ্বল হীরকাদি খচিত গন্ধপাত্রে, শেঠদিগের কণ্ঠবিলম্বিত স্থূলোজ্জ্বল মুক্তাহারে,— আর নর্তকীর প্রকোষ্ঠ কণ্ঠ, কেশ এবং কর্ণের আভরণে জ্বলিতেছিল। তাহার সঙ্গে মধুর গীতশব্দ উঠিয়া উজ্জ্বল মধুরে মিশাইতেছিল।

ঐশ্বর্যমন্ডিত এই সংগীত সভায় নর্তকী মনিয়াবাঈ গাইছিল 'সনদী খিয়াল'—'শিখো হো ছল ভালা'। লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ও ওয়াজেদ আলি শা'র সভাগায়ক সনদপিয়া রচিত খিয়ালধর্মী 'ঠুমরি'ই বোধহয় সেকালে 'সনদী খিয়াল' নামে পরিচিত ছিল। এই গীতকলিটি বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে দেবেন্দ্র দত্তর মুখেও ব্যবহার করেছিলেন। আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের সময় মেটিয়াব্রুজে লক্ষ্ণৌয়ের রাজ্যচ্যুত নবাব 'সংগীত সর্বস্ব' ওয়াজেদ আলি শা'র সংগীতের দরবার ছিল তখন কলকাতার মার্গসংগীত চর্চার অন্যতম পীঠস্থান।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে আমরা দেখি দুঃসহ স্মৃতির তাড়না থেকে মুক্তি পাবার জন্য গোবিন্দলাল সুরের নেশায় ডুবে থাকতে চেয়েছেন। রোহিনীকে নিয়ে প্রসাদপুরে থাকাকালীন তাঁর গৃহে আমরা দানেশ খাঁ নামে এক গায়কের দেখা পাই। দানেশ খাঁ ওস্তাদ গায়ক, বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করে কিছু না বললেও ওই অংশের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় এই গায়ক খিয়াল ঠুমরিতে পারদর্শী।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ 'নন্দনে নরক' অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র দিল্লি নগরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে দেখিয়েছেন সেখানকার 'গৃহে গৃহে সঙ্গীতধ্বনি, বহু জাতীয় বাদ্যের নিক্কণ'। নর্তকীর দল 'রাস্তায় লোক জমাইয়া সারঙ্গের সুরে নাচিতেছে, গায়িতেছে;' আর মোগল হারেমের তো কথাই নেই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ‘সংবাদ বিক্রয়’ অধ্যায়ে আমরা দেখি, ‘রঙ-মহালে গীতবাদ্যের বড় ধুম... রঙ-মহালে রাত্রিতে সুর লাগিয়াই থাকিত।’ হারেমের প্রতিহারী তাতারী থেকে শুরু করে বাদশাহজাদী সকলেই গীতলোলুপ। তবে মোগলহারেমে নৃত্যগীতের বাহুল্য লক্ষ্য করা গেলেও রূপনগরের রাজ অন্তঃপুরে কিন্তু সংগীত বা নৃত্যবিলাসের কোনো ছবি আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। কেবল চঞ্চলকুমারী ও নির্মলকুমারীর মুখে বঙ্কিমচন্দ্র শুনিয়েছেন দুটি হিন্দুস্থানি গাঁথা— ‘গৌরী সম্‌ঝে ভসমভার...’ এবং সোনে কি পিঁজিরা সোনে কি চিড়িয়া...’। আর চতুর্থ খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে মোগল-সেনাবেশী মানিকলালের কণ্ঠে শোনা গেছে উত্তর-মধ্য ভারতীয় লোকভাষার একটি গান,

শরম ভরমসে পিয়ারী,
সোমরত বংশীধারী,
ঝুরত লোচনসে বারি।
ন সমঝে গোপকুমারী,
যেহিন বৈঠত মুরারি,
বিহারত রাহ্ তুমারি।।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশকালে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় মানিকলালের কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্র একটি বাংলা গান ব্যবহার করেছিলেন— ‘যারে ভাবি দূরে সে যে সতত নিকটে/প্রাণ গেলে তবু সে যে রাখিবে সঙ্কটে।।’ গানটি বর্জিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত গানের কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আপামর দেশবাসীর যে গানটির কথা মনে পড়ে যায়, তা স্বাধীন ভারতের National Anthem তথা জাতীয়তার মহামন্ত্র ‘বন্দেমাতরম্’ সংগীত। পরাধীন ভারতে যে গান কণ্ঠে নিয়ে লক্ষ লক্ষ নরনারী স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, বীর বিপ্লবীর দল হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে চড়েছিল বন্দেমাতরম্ গাইতে গাইতে। বন্দেমাতরম্ গানটি প্রথম সংযোজিত হয় সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের প্রথম খন্ড দশম পরিচ্ছেদে। আর ‘আনন্দমঠ’ প্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ১৫ ডিসেম্বর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। যদিও ‘আনন্দমঠ’-এ প্রকাশের অনেক আগেই ১৮৭৫/৭৬ নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্র ‘বন্দেমাতরম্’ গানটি রচনা করেন। ফুটনোটে আছে মল্লার রাগ এবং কাওয়ালি তালে গানটি গীত। শোনা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের সংগীতগুরু যদুভট্ট ‘বন্দেমাতরম্’ গানে প্রথম সুরারোপ করেন। তবে যদুভট্ট কোন রাগ ও তালে গানটিতে সুর বসিয়েছিলেন তা অবশ্য জানা যায় না। ‘বন্দেমাতরম্’ গান একদিকে যেমন দেশবাসীকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছে, তেমনি এ গানকে ঘিরে বিভিন্ন সময় তৈরি হয়েছে নানা বিতর্ক। অঙ্গহানি ঘটেছে এ গানের। ‘বন্দেমাতরম্’ গানের রচনার ইতিহাস, একে ঘিরে তৈরি হওয়া সেইসব বিতর্ক প্রভৃতি দিকগুলি এক একটি পৃথক প্রবন্ধের বিষয়। সুতরাং এই সীমিত

পরিসরে সে পথে অগ্রসর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

'বন্দেমাতরম্' ছাড়াও 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে রয়েছে আরও দুটি গান— দ্বিতীয় খন্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাগীশ্বরী রাগিণীতে আড়া তালে আমরা শান্তির কণ্ঠে পাই— 'দড় বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে'। 'সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে', 'পায়ে ধরি প্রাণনাথ আমা ছেড়ে যেও না', 'ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা'

রঙ্গ ও রহস্যময়ী শান্তির এই গানে রয়েছে তার এবং তার স্বামী জীবানন্দের মনের কথা। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য সন্তানদলের সেনানী জীবানন্দ রমণী-সঙ্গ ত্যাগ করেছে। কিন্তু তার এই ব্রতসাধন তো অর্ধাঙ্গিনী বিনা সম্ভব নয়। তাই পরিহাসের সুরে শান্তি যেন এই গান গেয়েছে। তৃতীয় খন্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা আবার শান্তিকে পেলাম স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়ে যুগলকণ্ঠে গান শোনাতে। তার মনের সাধ এখন পূর্ণ। আসন্ন শত্রু- সমরে স্বামীর রণসঙ্গিনী হবে সে,

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

উপরোক্ত গান দুটি ছাড়াও আলোচ্য উপন্যাসে ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ ও শান্তির কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্র বসিয়েছেন জয়দেব গোস্বামী বিরচিত দুটি পদ— প্রথম খন্ড ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে 'ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিলেন'—'ধীরসমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী...' আর তৃতীয় খন্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে শান্তি গেয়েছে গোস্বামী কবির দশাবতার স্তোত্র—'প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্...।'

'আনন্দমঠ'-এর গীতোত্তেজনার পরে 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'- এ বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্যভাবে সংগীত-কৃপণ। 'দেবী চৌধুরাণী' তে তিনি সম্পূর্ণই গীতমৌন। শুধু সুরে বাজে বীণা ও বেণু। দ্বিতীয় খন্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বীণাবাদিনী দেবী চৌধুরাণীর এক অসামান্য ছবি এঁকেছেন বঙ্কিমচন্দ্র—

> ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া, সেই বহুরত্নমন্ডিতা রূপবতী সরস্বতীর ন্যায় বীণা বাদনে নিযুক্তা। ঝম্ ঝম্ ছন্ ছন্, ঝনন্ ঝনন্ ছনন্ ছনন্ দম্ দম্ দ্রিম দ্রিম বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল... । বীণা কখন কাঁদে, কখন রাগিয়া ওঠে, কখন নাচে, কখন আদর করে, কখন গর্জিয়া ওঠে—বাজিয়ে টিপি টিপি হাসে। ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, সিন্ধু কত মিঠে রাগিণী বাজিল—কেদার, হাম্বার, বেহাগ, কত গম্ভীর রাগিনী বাজিল। কানাড়া, সাহানা, বাগীশ্বরী—কত জাঁকাল রাগিণী বাজিল— নাদ, কুসুমের মালার মত নদী কল্লোল-স্রোতে ভাসিয়া গেল। তারপর দুই একটা পরদা উঠাইয়া নামাইয়া লইয়া, সহসা নুতন উৎসাহে উন্মুখী হইয়া সে বিদ্যাবতী ঝন্ ঝন্ করিয়া বীণের তারে বড় বড় ঘা দিল। কানের পিপুল পাত দুলিয়া উঠিল— মাথায় সাপের মত চুলের গোছা সব নড়িয়া উঠিল—বীণে নটরাগিণী বাজিতে লাগিল।

এ তো গেল উপন্যাসের কথা কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সংগীত বিষয়ক আলোচনা অপূর্ণ থেকে যায় 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর অন্তর্গত 'একটি গীত' শীর্ষক সন্দর্ভটির কথা উল্লেখ না করলে। কমলাকান্ত প্রসন্নকে কীর্তনের সুরে একটি গান শুনিয়েছিলেন—'এসো এসো বঁধু এস, আধ আঁচরে বসো...।' বঙ্কিম-অনুজ পূর্ণচন্দ্র

তাঁর 'কমলাকান্তের এস এস বধুঁ এস!' শীর্ষক রচনায় গানটির আলোচনা প্রসঙ্গে এক মহাষ্টমীর রাতের ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন,

> রাত্রি তখন অধিক হইয়াছিল। আলস্য বোধ হওয়াতে আমি একটা তাকিয়া মাথায় দিয়া শয়ন করিলাম, ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমায়াছিলাম জানি না, হঠাৎ নিদ্রিতাবস্থায় অতিদূরনিঃসৃত মধুর সংগীত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। আমার যে কি সুখানুভব হইল, তাহা যাঁহারা অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় মধুর সংগীত শুনিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল অনুভব করিতে পারবেন। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, আর পুর্ব্বোল্লিখিত (রেনেটি ঘরানার গায়ক বলহরি দাস) কীর্ত্তন-গায়কটি ঐ ঘরে একটী গীত গায়িতেছিল। যেমন মধুর গীত, তেমনই মধুর সুর।... গীতটি এই 'এসো এসো বঁধু এসো...' অনেকক্ষণ পরে গীত বন্ধ হইল। গায়ক বাহিরে উঠিয়া গেল। আমি তখন উঠিয়া বসিলাম, এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র বাম হস্তে মস্তক রাখিয়া নীরবে বসিয়া আছেন, মুখ হইতে নল খসিয়া পড়িয়াছে...

বঙ্কিমচন্দ্রের মনে এই গান কীরকম প্রভাব ফেলেছিল, আলোচ্য সন্দর্ভে তা তিনি নিজেই লিখে গেছেন,

> যখনই এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই— মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপরে যে বায়ুস্তর— শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই— এই গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন ভুলিতে পারিব না।

একদিকে ভারতীয় মার্গসংগীত অন্যদিকে কীর্তনঅঙ্গের গান—এই দুইয়ের যুগলমিলনে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি পরিপূর্ণ। তবে সব গানই যে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের লেখা এমন দাবি কেউই করবেন না। কারণ গীত-সংগ্রাহক বঙ্কিমচন্দ্র কখন কিভাবে কোন গান সংগ্রহ করেছেন তা বলা অত্যন্ত কঠিন। আবার এমনও অনেক গান রয়েছে যেগুলি স্পষ্টতই অন্যগানের সরাসরি প্রভাবে রচিত বোঝাই যায়। আর শুধু তো গান রচনা বা সংযোজনাই নয়, রাগ-তালের যথাযথ ব্যবহার প্রমাণ করে সংগীত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্যক্ ধারণা কতটা গভীর ছিল। আমরা আজকে 'মিউজিক থেরাপি'র কথা বলি, কিন্তু আজ থেকে দেড়শো বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—'কুলকামিনীরা সঙ্গীতনিপুণা হইলে, গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়।' গান মানুষের মনকে ভালো করে দেয়, সারিয়ে তোলে নানা রোগ—আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই তত্ত্বেরই কি প্রতিধ্বনি শোনা যায় না সংগীতপ্রেমী বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে?

উল্লেখসূত্র:

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সঙ্গীত', 'বঙ্কিম রচনাবলী' ২য় খন্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৪১১, পৃ. ২৪৯
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত

৪. পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘বঙ্কিমচন্দ্র ও কথকঠাকুর’, ‘বঙ্কিম-প্রসঙ্গ’, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সংকলিত, মুখার্জি অ্যান্ড বোস কোং, পৃ. ৩১-৩২
৫. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘বঙ্কিম-জীবনী’, অলোক রায় অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, পৃ. ২৭৪।
৬. দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘সঙ্গীতের আসরে’, ‘প্রবাসী’ আষাঢ় ১৩৭১ পৃ.২৫৮
৭. চন্দ্রনাথ বসু, ‘বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র’, ‘বঙ্কিম-প্রসঙ্গ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
৮. শ্যামলী চক্রবর্তী, ‘বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প ও সঙ্গীতের জগৎ’, অরুণা প্রকাশনী, পৃ.৬৮
৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘গীতিকাব্য’, ‘বঙ্কিম রচনাবলী’ ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৪।
১০. ‘দুর্গেশনন্দিনী’ ১ম খন্ড ১৫শ পরিচ্ছেদ।
১১. বিমানবিহারী মজুমদার, ‘পাঁচশত বৎসরের পদাবলী’, জিজ্ঞাসা, পৃ. ২৯১
১২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ‘বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া’, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১০৭
১৩. ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’ ১৪শ খন্ড, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩৬৮ পৃ. ১৯৪
১৪. গোপা দত্ত ভৌমিক, ‘বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে গান ও কবিতা : কিছু ভাবনা’, ‘বঙ্কিম স্মারকগ্রন্থ’, পিনাকেশচন্দ্র সরকার সম্পাদিত, বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র, পৃ. ১০৩
১৫. শ্যামলী চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
১৬. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ‘কীর্তন’, ‘বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ’ ৩৯, পৃ. ৫
১৭. শ্যামলী চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
১৮. পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘কমলাকান্তের এস এস বঁধু এস।’, ‘বঙ্কিম প্রসঙ্গ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২